ভারতে 'মাওবাদ'

দীপংকর চক্রবর্তী

ভূমিকার বদলে

'মাওবাদ' কথাটি আজকের ভারতের পটভূমিকায় খুবই প্রাসঙ্গিক। বিগত তিন থেকে চার দশকের মধ্যে ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মাওবাদীরা, অর্থাৎ সিপিআই(মাওবাদী) দলটি, তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলত, একদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-সহ শাসকশ্রেণীর স্বার্থবাহী সমস্ত দলের মতে এই মুহূর্তে মাওবাদীরাই হচ্ছেন দেশের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক। অন্যদিকে, শোষণ-নিপীড়নে জর্জরিত বহু মানুষ, বিশেষত মাওবাদীদের প্রভাবাধীন এলাকার বিপুল সংখ্যক সবচেয়ে বঞ্চিত ও সবচেয়ে দরিদ্র আদিবাসী তাঁদেরকেই বিবেচনা করছেন শোষণমুক্তির প্রকৃত দূত হিসেবে। মাওবাদীরা মাওসেতুঙের শিক্ষা অনুসরণ করে তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত চীন বিপ্লবের পথে ভারতকে মুক্ত করার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। এবং তাঁদের মতে, সেই পথটি হচ্ছে নির্বাচনী রাজনীতিকে চিরস্থায়ীভাবে বর্জন করে সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের তথা দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের পথ। ঘটনা হচ্ছে এটাই যে, এ দেশে তাঁরাই প্রথম নিজেদেরকে এই পথের পথিক হিসেবে ঘোষণা করছেন না, এর আগেও অন্তত দু'বার এই পথ অনুসরণ করে ভারতকে শোষণমুক্ত করার সংকল্প ঘোষিত হয়েছে, এবং আজকের মাওবাদীদের মতো তখনও অসংখ্য মানুষ সেই লক্ষ্য পূরণ করার জীবন-মরণ সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। আজকের মাওবাদীদের সম্পর্কে যে কোনো মূল্যায়ন করতে হলে, বা তাঁদের ব্যাখ্যামতো 'মাওবাদ'কে তাঁরা যে মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের সর্বোচ্চ রূপ বলে বিবেচনা করেন, প্রকৃতই সেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বা মাও-এর শিক্ষার অনুশীলন তাঁরা করছেন কিনা, তা বিবেচনা করতে হলে তাই এদেশে অতীতের চীন বিপ্লবের পথের অনুসারীদের কথাও আমাদের আলোচনার মধ্যে আনতে হবে।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভারতে যখন রুশ বিপ্লবের কামান-গর্জনের অভিঘাতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা হয়, তখন অনেক দেশে সেই মতাদর্শগত চেতনা দানাই বাঁধেনি। রুশ বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিল সেদেশে সংগঠিত কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু হবার দুই দশকের মধ্যে। চীনের মতো সম্পূর্ণ এক অন্য ধরনের সমাজেও সেটা সম্ভব হয়েছিল মাত্র তিন দশকের মধ্যে। অথচ ভারতে সংগঠিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা হবার পর প্রায় নয় দশক অতিক্রান্ত হলেও, আজ পর্যন্ত সেই লড়াই সমাজ-বিপ্লবের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারেনি। কেন এমনটা ঘটলো, তার ব্যাখ্যা দেওয়াটা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, এখানে সে চেষ্টা আমরা করবোও না। কিন্তু একথা বলতেই হবে যে, কমিউনিস্ট মতাদর্শ অনুসারে, কোনো দেশের বাস্তব প্রেক্ষিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সেই দেশের বিপ্লবের সঠিক পথটি— সঠিক রণনীতি ও কৌশল, খুঁজতে গিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অধিকাংশ সময়েই ব্যর্থ হয়েছে, নিজেদের পায়ের তলার মাটি চিনে উঠতে পারে নি— কখনও বাঁয়ে, কখনও বা ডাইনে টলতে টলতে আন্দোলন বিচ্যুতির গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে মরেছে, এবং এখনও মরছে। এবং হাজার হাজার শহীদের আত্মবিসর্জন ও অসংখ্য কর্মীর অনুপম আত্মত্যাগ সত্ত্বেও, এখনও তা পথ খুঁজছে আর পথ খুঁজছে, এবং বিপ্লব যেন দূর থেকে আরও দূরায়ত, প্রায় সুদূরপরাহত হয়ে পড়ছে।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনাপর্বে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে এই আন্দোলনের মর্মার্থ পৌঁছে দিয়ে প্রাথমিক বিকাশ ঘটাবার প্রক্রিয়ায় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কিছু কার্যকর ভূমিকা নিলেও, একটি দেশের নির্দিষ্ট সমাজ-বাস্তবতার মূল চরিত্রটি যে বাইরে থেকে ঠিক করে দেওয়া যায় না, বারবার বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে তার প্রমাণ মিলেছে। এ-ব্যাপারে চীন বিপ্লবের পথপ্রদর্শক ও স্থপতি মাও-এর একটি মূল্যায়ন সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না : "*সাধারণভাবে বলতে গেলে, চীনের সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কমরেডরা নয়, বরং চীনারাই চীনের বাস্তব জগতের সম্যক উপলব্ধি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এই সব কমরেডরা চীনের সমাজ, চীন দেশ ও চীন বিপ্লবকে অনুধাবন করে উঠতে পারেন নি— বা, আমরা বলতে পারি, তাঁরা সেগুলি ভালোভাবে উপলব্ধি করে উঠতে পারেন নি।*"[১] আর ভারতের কমিউনিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত মেধা ও সাংগঠনিক গুণের সমাহার ঘটলেও, তাঁরা প্রথম থেকে প্রায় সব সময়েই নির্ভর করে থেকেছেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কমরেডদের উপর, বিশেষত বেন ব্র্যাডলে, হ্যারি পলিট বা রজনীপাম দত্ত প্রভৃতি বৃটেনের কমিউনিস্ট নেতাদের উপর, এবং তা-ও বহু ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্যের যান্ত্রিক ব্যাখ্যার উপর। ভারতের বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক উপলব্ধির প্রত্যক্ষ ও সবচেয়ে বেশি সুযোগ যে রয়েছে তাঁদেরই, বারংবার তাঁরা তা বিস্মৃত হয়েছেন। বিভিন্ন দেশের বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী বিপ্লবের বিভিন্ন পন্থা অনুসরণের আবশ্যিকতাও মূলত তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন নি। ফলত, এ দেশে বিপ্লবের সম্ভাবনা ক্রমশ দূরায়ত হয়ে পড়েছে।

আর ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে ভারতে সমাজ-বিপ্লব সম্পন্ন করতে হলে কোন্ পথে এগোতে হবে— সেই প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে এ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম পর্বে ধরা পড়েছে অনেকটাই যান্ত্রিকভাবে মূলত রুশ বিপ্লবের পথ অনুসরণের প্রবণতা। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় অধিবেশনে গৃহীত লেনিনের তত্ত্বে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক প্রাক্-পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমাজ-বিপ্লবের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক স্তরদুটির পৃথকীকরণের তথা এক সম্ভাব্য স্বতন্ত্র পথের কথা বলা হলেও, পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক বা এদেশীয় নেতৃবৃন্দের ভাবনা-চিন্তায় সবসময় তার বিশেষ পরিচয় মেলে নি। কিন্তু বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের শুরু থেকেই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চীন বিপ্লবের ধারাবাহিক বিজয় অর্জনের প্রেরণাসঞ্চারী অভিজ্ঞতা এদেশেও প্রভাব বিস্তর করতে থাকে। তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রচিত হয় চল্লিশের দশকে, বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে।

কিন্তু সেই প্রসঙ্গে আসার আগে তখন ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরাজমান পটভূমিটি একটু দেখে নেওয়া দরকার। ১৯৪৭-এ ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়, বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসকদের স্থলাভিষিক্ত হয় মূলত তাদের ওপর নির্ভরশীল এদেশের পুঁজিপতিশ্রেণী বৃহৎ জমিদার-জোতদারদের সাথে জোট বেঁধে। ভারতের সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখা হবে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ছিল বিতর্ক ও সংশয়। এদিকে ১৯৪৩-এ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (*কমিনটার্ন*)-এর বিলুপ্তি ঘটাবার পর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র ও সমন্বয়ের স্বার্থে ১৯৪৭-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল *কমিনফর্ম*। সেই সংগঠনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সোভিয়েত তাত্ত্বিক ঝানভ উপস্থাপিত করেছিলেন যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দু'টি বৈরিতামূলক শিবিরে বিভাজন ও তার প্রেক্ষিতে সমস্ত দেশের কমিউনিস্টদের সেই সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই চালাবার আবশ্যিকতার তত্ত্ব। ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ঝানভের তত্ত্বের চেয়েও আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে গ্রহণ করলেন যুগোশ্লাভ সংশোধনবাদী কার্দেলির তত্ত্ব— যে তত্ত্ব অনুসারে বিপ্লবের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক স্তর দু'টি এক ধাক্কায় সমাধা করার নিদান দেওয়া হয়েছিল। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ১৯৪৮-এ পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে নির্বাচিত সম্পাদক রণদিভে দাবি করলেন : ভারত আর আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশ নয়— বরং পুরোপুরি পুঁজিবাদী দেশ, কাজেই এখানে একসঙ্গে দেশজোড়া অভ্যুত্থান-ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই হবে মুক্তির সঠিক পথ। এটাই ছিল পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের চরম 'বাম' সংকীর্ণবাদী রণদিভে লাইন। কিন্তু চীন বিপ্লবের অভিজতা থেকে শিক্ষা নিয়ে গড়ে তোলা তেলেঙ্গানার ক্রমঘনায়মান বিপ্লবী লড়াইয়ের তীব্রতার সামনে সেই ভ্রান্ত লাইনকে পিছু হঠতে হলো।

চীন বিপ্লবের পথ : প্রথম পর্ব

উল্লেখ্য যে, চীনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতে বিপ্লবের প্রকৃত অর্থে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল চীন বিপ্লব বিজয় অর্জন করারও আগে। করদ রাজ্য হায়দ্রাবাদের নিজামের নিয়ন্ত্রণাধীন সেই অঞ্চলটি ছিল চরমতম সামন্ততান্ত্রিক শোষণের শিকার। তেলেঙ্গানায় কমিউনিস্টরা সক্রিয়তা দেখাতে শুরু করেন ১৯৩৯-৩০ থেকে, তেলেগুভাষীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থে গড়ে ওঠা অন্ধ্র মহাসভার মধ্যে থেকে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের ক্রমবর্ধমান কর্মতৎপরতার ফলে ক্রমশ তাঁরাই ১৯৪৩-এর মধ্যে এই সংগঠনের নেতৃত্বে চলে আসেন। কৃষকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে ব্যাপক কৃষকসমাজকে সংগঠিত করার মধ্যে দিয়ে তাদের লড়াই ক্রমশ জঙ্গি রূপ ধারণ করতে থাকে। নিজামের রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই ক্রমশ নিজামের শাসন অবসানের দাবিতে পরিণত হয়। ১৯৪৬-এর মধ্যে সেই লড়াই বস্তুত সামন্ততন্ত্র ও নিজামশাহীর বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। প্রায় ৩০ হাজার সৈন্যবিশিষ্ট নিজামশাহী বাহিনী প্রচণ্ড অত্যাচার নামিয়ে এনেও ক্রমশ পিছু হটতে বাধ্য হয়। চীনের চলমান বিপ্লবী যুদ্ধের পথ অনুসরণ করে ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সমগ্র হায়দ্রাবাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মুক্ত হয়েছিল, ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম মুক্তাঞ্চল — লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা— স্বাধীন এক জনগণতন্ত্র, ৩০০০ গ্রামের প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষকে নিয়ে। গঠিত হয়েছিল নিয়মিত সৈন্যবাহিনী (দলম)— প্রায় ২০০০ জনের গেরিলা বাহিনী ও গ্রামবাসীদের ১০ হাজার স্থানীয় বাহিনীর (মিলিশিয়া) সদস্য নিয়ে। জমিদারদের প্রায় এক লক্ষ একর জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল। মুক্তাঞ্চলে নির্বাচনের মাধ্যমে 'গ্রাম-সরকার' বা 'গ্রাম-পঞ্চায়েত' গঠিত হয়েছিল। স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা থেকে শুরু করে বিচার ব্যবস্থা, গ্রামরক্ষীবাহিনী, জমি দখল ও তার পুনর্বণ্টন, প্রকৃত কৃষককে মালিকানা প্রদান ইত্যাদি সবই পরিচালনা করতো এই 'গ্রাম-পঞ্চায়েত'।[২]

এই বিপ্লবের খবর ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে, নতুন উদ্দীপনা জন্ম নিচ্ছিল। স্বাধীন ভারতের নেহরু সরকার বিপদ গুণেছিল। এতদিন তাঁরা এই লড়াই দমন করবার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন নিজামকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। এখন সুযোগ বুঝে তাঁরা হায়দ্রাবাদকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন এবং প্রায় ৬০ হাজার ভারতীয় সৈন্যকে সরাসরি যুদ্ধে নামিয়ে দিলেন। তবু বিপ্লবী তেলেঙ্গানা প্রাণপণ এক অসম যুদ্ধ

Second Time

চালিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তার উপর আঘাত এসেছিল ভিতর থেকেই— ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। এই দ্বিবিধ আক্রমণের সামনে শেষ পর্যন্ত এই লড়াই প্রত্যাহৃত হয়।

বিষয়টির একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা দরকার। এই লড়াইয়ের ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর রণদিভে নেতৃত্ব চেষ্টা করেছিল সারা দেশব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় তেলেঙ্গানার মতো লড়াই গড়ে তুলে তাদের সারা দেশব্যাপী অভ্যুত্থান-ভিত্তিক এক ধাক্কায় বিপ্লবের লাইনকে কার্যকর করতে। তাঁদের এই ভ্রান্ত লাইনকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানালেন অন্ধ্রর পার্টি-নেতৃত্ব। তাঁরা তাঁদের অন্ধ্র থিসিসে স্পষ্ট ঘোষণা করলেন: ভারতীয় বিপ্লব হবে অনেকাংশেই চীন বিপ্লবের প্রদর্শিত পথে— মাও সেতুং-এর নয়া গণতন্ত্রের দুই স্তর বিপ্লবের তত্ত্বের অনুরূপ— দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ-ভিত্তিক সশস্ত্র কৃষি বিপ্লব। অন্ধ্র, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা প্রভৃতি কৃষক সংগ্রামে উত্তাল অঞ্চলে যেখানে যেখানে সম্ভব, এই বিপ্লবকে ছড়িয়ে দিতে হবে। রণদিভে এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বললেন: ''মাও একজন নিকৃষ্ট মানের মার্কসবাদী'', ''তাঁর লাইন কোনো কমিউনিস্টের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়''। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে পিছু হটতেই হলো, কারণ *কমিনফর্ম* এবং সদ্য-বিজয়ী চীনের নেতৃত্ব কার্যত অন্ধ্র থিসিসকে সমর্থন জানালো । ১৯৫০-এর প্রথমে সোভিয়েত তাত্ত্বিক বালাবুশেভিচ সরাসরি তেলেঙ্গানা বিপ্লবকে ভারতে জনগণতন্ত্র স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টা ও 'কৃষি বিপ্লবের অগ্রদূত' বলে অভিহিত করলেন। ১৯৪৯-এর নভেম্বরে পিকিং-এ অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে চীনের পার্টির পক্ষ থেকে বলা হলো: অনেক ঔপনিবেশিক ও নির্ভরশীল দেশকেই জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য,'যখন ও যেখানে সম্ভব' মাওসেতুঙের পথ, অর্থাৎ চীন বিপ্লবের পথ অনুসরণ করতে হবে।[৩] ১৯৫০-এর ২৭ জানুয়ারি কমিনফর্মের মুখপত্র *ফর এ লাস্টিং পিস, ফর এ পিপল্‌স ডেমোক্র্যাসি*-তে 'মাইটি অ্যাডভান্স অফ দি ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেন্ট অফ দি কলোনিয়াল অ্যান্ড ডিপেন্ড্যান্ট কানট্রিজ' নিবন্ধে চীনের ওই বক্তব্য উদ্ধৃত ও সমর্থন করে বলা হলো : জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিজয় অর্জনের জন্য একটি নির্ধারক শর্ত হচ্ছে, ''দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে'', কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গণমুক্তি ফৌজ গড়ে তোলা; এবং এ-ব্যাপারে চীন-সহ ভিয়েতনাম, মালয় প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা দরকার।

স্বভাবতই তেলেঙ্গানা লাইনের প্রতি সোভিয়েত ও চীন পার্টির এই সুস্পষ্ট সমর্থনের পর রণদিভের পক্ষে আর নেতৃত্বে থাকা সম্ভব হলো না। ফলত নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেন রাজেশ্বর রাও প্রভৃতি অন্ধ্র পার্টির নেতারাই। তাঁরা ভারতে বিপ্লবের পথ হিসেবে চীনের পথকেই 'যেখানে যেখানে সম্ভব' অনুসরণ করে তেলেঙ্গানা ধরনের লড়াই গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু পার্টির মধ্যেই এই পথ নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক শুরু হলো। ডাঙ্গে-অজয় ঘোষ-ঘাটে ত্রয়ীর উপদল ও অন্ধ্রের রবিনারায়ণ রেড্ডি প্রভৃতিরা এক জোট হয়ে এর বিরোধিতা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ে 'পরামর্শ' নেবার জন্য দু'পক্ষের দু'জন করে প্রতিনিধি মস্কোয় গিয়ে স্তালিন-সহ সোভিয়েত নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করলেন। সেই পরামর্শের ভিত্তিতে প্রণীত হলো পার্টির নতুন রণকৌশলগত লাইন (Tactical Line)। তাতে মুক্তির জন্য সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের অনিবার্যতার উপর জোর দিয়ে সাথে সাথে হঠকারিতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেওয়া হলো, এবং ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিতে চীনের তুলনায় শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শ্রমিকশ্রেণীর অধিকতর বিকাশের প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র বিপ্লবী যুদ্ধের উপর নির্ভর না করে আইনি-সহ সম্ভাব্য সমস্ত রকম লড়াইয়ের পন্থাকে ব্যবহার করার আবশ্যিকতার কথা বলা হলো। সেই সুযোগ নিয়ে, তাতে তেলেঙ্গানার লড়াই প্রত্যাহার করার কথা বলা না হলেও, এদেশের নেতৃত্বের সুবিধাবাদী অংশের বিশ্বাসঘাতকতা ও চক্রান্তে, তেলেঙ্গানার সংগ্রামী মানুষদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সেই লড়াই তুলে নিয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ের পথ বেছে নেওয়া হলো। লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত অধিকার গায়ের জোরে কেড়ে নেবার এ সুযোগ শাসকশ্রেণী স্বভাবতই ছাড়লো না।

তেলেঙ্গানার লড়াই মূলত নেতৃত্বের চক্রান্তে ব্যর্থ হলেও, এই লড়াই থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল।[৪] প্রথমত, কৃষি বিপ্লব সশস্ত্র হলেও, জমি ও ফসলের জন্য কৃষকের লড়াই থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করলে চলবে না। দ্বিতীয়ত, 'গণ লাইন'কে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে হবে, গণ সংগঠন ও গণ সংগ্রামের মাধ্যমে কৃষক জনতাকে সমাবেশিত ও সংগঠিত করতে হবে। তৃতীয়ত, গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করে লড়াই চালানোটা এর সর্বোচ্চ রূপ হলেও, তার সাথে সাথে লড়াইয়ের সম্ভাব্য সমস্ত রূপকে সম্ভবমতো ব্যবহার করতে হবে। পরে আমরা দেখবো, এই শিক্ষাগুলি কাজে না লাগানোর ফলে কী নিদারুণ ব্যর্থতা পরবর্তীকালে বরণ করতে হয়েছিল।

দুই লাইনের লড়াই

পরবর্তী এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস মতাদর্শগত ও উপদলীয় লড়াইয়ের ইতিহাস। তেলেঙ্গানার সময় থেকেই সশস্ত্র বিপ্লব, না সংসদীয় পথ— কোন্ পথে এগোবে লড়াই, তা নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। ১৯৫২-তে ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের পর থেকে সংসদীয় লাইনই প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। ১৯৫৬-তে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ

Second Time

কর্তৃক প্রকাশ্য নিঃস্তালিনীকরণ অভিযান শুরু হবার পর এই লাইন আরও জোরদার হয়ে ওঠে। ক্রুশ্চভ সংসদীয় পথে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের তত্ত্ব হাজির করেন। আপাদমস্তক মার্কসবাদ-বিরোধী এই তত্ত্বটি ভারতের পার্টি কার্যত গ্রহণ করলো, এবং মূলত এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পার্টির মধ্যে মতবিরোধ আরও বেড়ে গেলো। ষাটের দশকের সূচনাতেই চীন-সোভিয়েত মতাদর্শগত বিতর্কে চীনের পার্টি ক্রুশ্চভের অন্যান্য ভ্রান্ত তত্ত্ব ও বিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিবিপ্লবী তত্ত্বকেও সরাসরি আক্রমণ করে। শুরু হয় চীন ও সোভিয়েত পার্টির মধ্যে আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত বিতর্ক। সেই বিতর্কের প্রভাবে ভারতেও বিভিন্ন প্রশ্নে মতাদর্শগত বিতর্ক তীব্রতর হয়ে ওঠে। ১৯৫৯-এ ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ এবং '৬২-তে ভারত-চীন যুদ্ধ সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে।

বিপ্লবী কর্মীদের অধিকাংশই সেসময় চীনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন, এবং মতাদর্শগতভাবে ও বাস্তব ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে পার্টির মধ্যেকার বিভাজন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হতে শুরু করে। তারই পরিণতিতে ১৯৬৪-তে সিপিআই দু'ভাগ হয়ে যায়, জন্ম নেয় সিপিআই(এম) । উল্লেখ্য যে, এই বিভাজন কিন্তু শুধু মতাদর্শগত প্রশ্নকে সামনে রেখে হয় নি, উপদলীয়তারও একটি ভূমিকা ছিল। তবে এই নতুন পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মী মতাদর্শগতভাবে সংসদের প্রতি অনুসরণীয় দৃষ্টিভঙ্গি-সহ বিভিন্ন প্রশ্নে চীনের অবস্থানের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু নতুন এই পার্টি-নেতৃত্বের অধিকাংশেরই মতাদর্শগত অবস্থান ছিল মধ্যপন্থী বা প্রচ্ছন্নভাবে সোভিয়েত পার্টিরই পক্ষে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মীকে দলে টানার জন্য তাঁরা আপাত-চীনপন্থী একটি অবস্থান নিতে কসুর করেননি। (১৯২০-র দশকে) পার্টির সামনের সারির নেতা ডাঙ্গের ব্রিটিশ সরকারের কাছে কার্যত মুচলেকা দিয়ে লেখা এবং সে-সময়ে ফাঁস-হয়ে-যাওয়া আত্মসমর্পণবাদী চিঠি-কে তাঁরা পার্টি-বিভাজনের একটি প্রধান অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত তথ্যের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই ডাঙ্গেকেই সভাপতি ও নাম্বুদ্রিপাদকে সাধারণ সম্পাদক করে পার্টির জাতীয় পরিষদকে পুনর্গঠিত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁরা, এবং সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার পরই কেবল তাঁরা নতুন পার্টি গড়ার পথে পা বাড়ান। শুধু তা-ই নয়, পার্টির পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে, এমনকি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দের কাছে পর্যন্ত হাজির হয়ে বারবার ঘোষণা করা হয় যে, পার্টি হিংসার পথে যাবে না। কিন্তু ব্যাপক কর্মীদের সমর্থনের প্রত্যাশায় তাঁদের সেই সমস্ত অবস্থান ও কাণ্ডকারখানা তাঁরা অনেকটাই প্রচ্ছন্ন রেখে দিয়েছিলেন। অবশ্য নতুন পার্টি গড়ার সূচনা পর্বেও তার প্রমাণ মিলে যায়। সারা পৃথিবীতে সম্ভবত এই প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত দলিল ছাড়াই একটি কমিউনিস্ট পার্টি জন্ম নেয়, ১৯৬৪-র ৭ম পার্টি কংগ্রেসে।

সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি অনুসরণীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে সিপিআই-এর মূলত ভ্রান্ত সংশোধনবাদী অবস্থানের বিপরীতে নতুন এই পার্টিটি আপাতদৃষ্টিতে একটি সঠিক অবস্থান নিলেও, তার মধ্যেই নানা ফাঁক-ফোকড় থেকে যায় (মতান্তরে, রেখে দেওয়া হয়)। পরবর্তীকালে সেগুলির মধ্যে দিয়ে সংশোধনবাদী অবস্থানে চলে যাবার পথ প্রশস্ত হয়। উল্লেখ্য যে, নতুন পার্টি গঠনের প্রক্রিয়ায় আলোচনার জন্য প্রচারিত প্রাথমিক খসড়া কর্মসূচিতে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির আকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করা হলেও, শাসকশ্রেণী যে কখনও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না— এই বক্তব্য অধিকতর গুরুত্ব পায়। সংসদীয় ও সংসদ-বহির্ভূত সংগ্রামের সমন্বয় ঘটিয়ে ক্ষমতা দখলের লাইনটিই মূলত সেখানে উপস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত চূড়ান্ত কর্মসূচিতে প্রথম ক্ষেত্রে বক্তব্যের গুরুত্বের দিকটিকে লঘু করে দেওয়া হয়; এবং একটি নতুন ধারা (১১২ নং) সংযোজিত করে সুযোগ পেলে "*জনগণের আশু সমস্যাবলী প্রশমন করতে পারে এবং এইভাবে গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে পারে এমন একটি অতিক্রান্তিকালীন সরকার গঠন*"-এর কথা বলা হয়। তবে বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথাও সেখানে স্বীকার করা হয়েছিল। ডিমিট্রভ ১৯৩৫ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসের রিপোর্টে বলেছিলেন— বিপ্লব যখন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, তখন বাস্তব অবস্থার বিচারে কমিউনিস্টরা সরকারে অংশ নিতে পারে; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তাদের মুখ্য কাজই হবে উৎপাদন ও আর্থিক ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ করা, পুলিশ-সশস্ত্র বাহিনী প্রভৃতি রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতিয়ারগুলিকে ভেঙে বা অকেজো করে দেওয়া এবং পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত ও সশস্ত্র করে তোলা; সবচেয়ে বড়ো কথা, বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যে নির্বাচন বা সরকারে কমিউনিস্টরা অংশ নিলেও, সেগুলি সম্পর্কে মোহ বাড়ানো নয়, বরং মোহ ভাঙা তথা বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটিত করাটাই হবে তাদের মূল লক্ষ্য। সংসদীয় নির্বাচনে বা সরকারে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে সংসদ-সর্বস্বতার শিকার হয়ে পড়ার বিপদ সম্পর্কে মার্কসবাদী এই সতর্কবার্তা কিন্তু কোনো দিনই এই নতুন পার্টির কর্মসূচিতে বা কোনো রাজনৈতিক প্রস্তাবে স্থান পায়নি। স্থান পায়নি লেনিনের প্রাসঙ্গিক এই দিকনির্দেশও যে, "*পার্লামেন্টের ভেতরকার কাজকে পুরোপুরিভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে পার্লামেন্ট-বহির্ভূত গণআন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্তব্যের অধীন হতে হবে।*" শান্তিপূর্ণ সংসদীয় পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ক্রুশ্চভীয় তত্ত্বের অনুসারী ছিল সিপিআই, তাই সেই অবিভক্ত পার্টি ভেঙে সিপিআই(এম) গড়ার প্রয়োজন হয়েছিল বলে নেতৃত্বের এতদিনকার প্রচারের

Second Time

অসারতা আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, যখন সিপিআইএম-এর সবচেয়ে সামনের সারির নেতারাও পরবর্তীকালে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে, সংসদীয় পথ ছেড়ে আসার কোনোরকম পরিকল্পনাই তাঁদের নেই, বরং "*এই পথে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসতে পারে কিনা দেখার জন্য একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট*" তারা চালাচ্ছেন।

চীন বিপ্লবের পথ : দ্বিতীয় পর্ব

১৯৬৪-তে সিপিআইএম-এর জন্মমুহূর্ত থেকেই পার্টি-কর্মসূচি নিয়ে, বিশেষত রণনীতি ও রণকৌশল নিয়ে, যুক্তিযুক্তভাবেই যে গভীর বিতর্ক ছিল, বিভিন্ন মতাদর্শগত প্রশ্নে পার্টির আপাত-বামপন্থী অবস্থানের স্বরূপ উদঘাটিত হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তার তীব্রতা বাড়তে থাকে। এই পটভূমিতেই ১৯৬৭-তে পশ্চিমবঙ্গে সিপিআইএম যুক্তফ্রন্ট সরকারে যোগ দেবার তিন মাসের মধ্যে নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের ওপর পুলিশ গুলি চালায়, নারী ও শিশু সহ ৯ জন নিহত হন। এই ঘটনার পরিণতিতেই পার্টির মধ্যে আবার ভাঙন ধরে। বিরোধী মতাবলম্বীরা বহিষ্কৃত হন এবং তাদের অধিকাংশ মিলে ১৯৬৯-এ জন্ম দেন একটি নতুন পার্টি— সিপিআই(এম-এল)।

এই নতুন পার্টিটি প্রথম থেকেই ঘোষণা করেছিল : চীন বিপ্লবের পথই হচ্ছে ভারতের মুক্তির পথ। সেই পথ ধরে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দেওয়া হয়েছিল। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় নির্বাচনের প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হবে এই প্রশ্নে, আগেই বলেছি, সংসদীয় পথে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের চরম দক্ষিণপন্থী এবং আপাদমস্তক মার্কসবাদ-বিরোধী অবস্থান আগেই নিয়ে ছিল সিপিআই। সিপিআই(এম) সংসদীয় ও সংসদ-বহির্ভূত সংগ্রামের সমন্বয়ের আপাত-সঠিক লাইন প্রথমে নিলেও, সংসদীয় লড়াইকে যে *অতিঅবশ্যই ও পুরোপুরি সংসদ-বহির্ভূত গণসংগ্রামের লক্ষ্য ও কর্তব্যের অধীন হতে হবে*— লেনিনের এই শিক্ষাকে কোনোদিন তুলে ধরে নি, এবং শেষ পর্যন্ত সংসদীয় কার্যক্রমকেই বাস্তবে মূল গুরুত্ব দিয়ে কার্যত এ-ব্যাপারে সিপিআই-এর অবস্থানের সঙ্গে প্রায়-অভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছে। আর এই নতুন এম-এল পার্টিটি প্রায় প্রথম থেকেই নিয়েছিল এর একেবারে বিপরীত অবস্থান— সংসদীয় নির্বাচনকে ভারতের মতো দেশে স্থায়ীভাবে বয়কটের লাইন। এই বয়কটের পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল: '*আজকের যুগে*' রণনীতিগতভাবেই সংসদীয় লড়াইয়ে অংশ নেবার প্রশ্ন ওঠে না; ভারতের মতো আধা-উপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে, বিশেষত সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি যেহেতু আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের তৈরি ও নিয়ন্ত্রিত, তাই তাতে অংশ নিয়ে কোনো লাভ নেই। সূচনাপর্বে অনুসৃত এম-এল পার্টির এই লাইনটি সংসদ-সর্বস্বতার সংশোধনবাদী লাইনের ১৮০ ডিগ্রি বিপরীত হতে পারে, কিন্তু তাই বলেই কিন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই লাইন সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ মূল প্রশ্নটা বিপ্লবের— সংসদে অংশগ্রহণের বা তা বয়কটের নয়। গত দেড়শো বছরে মার্কসীয় তত্ত্ব ও তার অনুশীলন থেকে প্রাসঙ্গিক যে শিক্ষাটি বেরিয়ে এসেছে তা হচ্ছে এই যে, এ-ব্যাপারে যে অবস্থান নিলে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে সহায়ক হয়, সেটাই নিতে হবে। যে কারণে লেনিন কমিউনিস্টদের সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবশ্যিক বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। চীনে বাস্তবত কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার বা পার্লামেন্টের অস্তিত্ব ছিল না, তাই সেখানে সে প্রশ্ন ওঠার সুযোগই ছিল না। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাই পার্লামেন্টে অংশ নেওয়া চলবে না, মাও কখনোই এ জাতীয় কোনো নিদান হাঁকেন নি, বরং স্পষ্ট বলেছেন, "ব্যবহার করার মতো কোনো পার্লামেন্ট চীনে নেই"। অর্থাৎ থাকলে তাঁরা অংশগ্রহণ করার কথা বিবেচনা করতে পারতেন। তবে মাও নিজে ও চৌ এন-লাই প্রভৃতিরা ১৯৩৮-এ কুয়োমিন্টাংদের সঙ্গে জাপানি-আগ্রাসন-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট চলার সময় চিয়াং কাইশেক সরকার কর্তৃক (জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত নয়, অর্থাৎ মনোনীত) 'ন্যাশনাল পলিটিক্যাল কাউন্সিল অফ চায়না'-তে মনোনীত হয়ে অংশ নিয়েছিলেন, এবং এই প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন: *যদিও এই কাউন্সিলটি জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত ছিল না, তবুও এটি ছিল চীনের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের কার্যকর বিকাশের পরিচায়ক।*[৫] কিন্তু নকশালপন্থীরা সেই শিক্ষার সঠিক অনুশীলন করতে বিশেষভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। উপরন্তু চারু মজুমদার ঘোষণা করেছিলেন যে, মাও সেতুং-চিন্তাধারাই হচ্ছে এ যুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, এই যুগে বুর্জোয়া সংসদীয় সংস্থাগুলি সাধারণভাবে, এবং বিশেষত ভারতের মতো ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির ক্ষেত্রে বিপ্লবের অগ্রগতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। তিনি দাবি করেছিলেন, নির্বাচন বয়কটের আহ্বানটি সমগ্র বর্তমান যুগ ধরেই প্রাসঙ্গিক। পরবর্তী অংশে আমরা আরও দেখবো, বর্তমান যুগ সম্পর্কেই তাঁর এই বক্তব্যটি ছিল স্বয়ং মাও এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যের বিরোধী।

অথচ এটা ঘটনা যে, এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন যখন পার্লামেন্ট-সর্বস্বতার কানাগলিতে ক্রমশ নিমজ্জিত হয়ে চলেছিল, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করার চিরায়ত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় বিসর্জিত হয়েছিল, এবং ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের লাইনটি কার্যত পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তখন নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ধ্বনিত বসন্তের বজ্র-নির্ঘোষটি বাস্তবত সমাজ বদলের কর্মসূচি নতুন করে

Second Time

বিপ্লবীদের সামনে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। কিন্তু সেই কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য সঠিক রণকৌশল তথা পদ্ধতি গড়ে তুলতে নকশালপন্থীরা ব্যর্থ হয়েছিলেন।

বিশেষত আরও দুঃখজনক হচ্ছে এটাই যে, ভারতের বুকে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের বাস্তব অনুশীলনের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে সফল ও সার্থক যে তেলেঙ্গানা বিপ্লব, তার অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত শিক্ষাগুলিকে এই আন্দোলনে সুনিশ্চিতভাবে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যিক হলেও, এই আন্দোলনের নেতারা সেই প্রচেষ্টা প্রায় নেননি বললেই হয়। উপরন্তু নকশালবাড়ির যে আন্দোলনটি মূলত ছিল কৃষকদের দাবি পূরণের লড়াই, তাকেই অযৌক্তিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য লড়াই বলে বাড়িয়ে দেখা হয়েছিল । মাও বলেছিলেন, অতীতের বিভিন্ন কৃষক লড়াই থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়োজনমতো ও বাস্তবসম্মতভাবে শিক্ষা নেওয়াটাই চীন বিপ্লবের সফলতার অন্যতম কারণ ছিল। কিন্তু নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতারা, আগেই বলেছি, ভারতে সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের পথের সবচেয়ে সার্থক অনুশীলন হয়েছিল যে তেলেঙ্গানার লড়াইয়ে, তার থেকে প্রায় কোনো শিক্ষাই নেবার চেষ্টা করেন নি। যাঁরা নিজেদেরকে মাও-এর অনুসারী বলে ঘোষণা করছেন, তাঁরাই রণনীতি ও রণকৌশলগত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষা বিস্মৃত হয়েছিলেন— এটাই ট্র্যাজেডি।

আসলে তাঁদের এই ব্যর্থতার উৎস ছিল একধরনের '*বাম*' লাইন, যার পরিণতিতে নকশালপন্থী আন্দোলনের মূল ধারাটি শুরু থেকেই গণলাইন বর্জন করে চলেছিল। অথচ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনার সময় থেকেই কমিউনিস্টদের রণকৌশলের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে গণসংগঠন গড়ে তোলা এবং সংগ্রামের সমস্ত ধরনের আইনি, আধা-আইনি ও বেআইনি পদ্ধতি ব্যবহার করে বিপ্লবের প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়া। বিপ্লবের বিজয় অর্জনের জন্য সশস্ত্র বিপ্লব অবশ্যই আবশ্যিক, এবং সেকারণেই ব্যাপক মেহনতি মানুষের শ্রেণী-চেতনার বিকাশ ঘটাবার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রেণী-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া আবশ্যিক। এই চিন্তা থেকেই কার্ল মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এ শ্রমিকশ্রেণীর আশু অর্থনৈতিক স্বার্থে কমিউনিস্টদের লড়াই সংগঠিত করার ওপর জোর দিয়েছেন; যে সব বিপ্লবী সংগ্রামের বেআইনি রূপের সাথে আইনি রূপের সমন্বয় ঘটাতে পারেন না, লেনিন তাঁদের নিন্দা করেছেন; আর মাও চীনের প্রেক্ষিতে যুদ্ধ সংগ্রামের প্রধান রূপ ও সেনাবাহিনী সংগঠনের প্রধান রূপ হলেও, অন্যান্য সমস্ত ধরনের গণসংগঠন ও গণসংগ্রাম গড়ে তোলাকে আবশ্যিক বলে গুরুত্ব দিয়েছেন। অথচ নকশালপন্থীরা চারু মজুমদারের লাইন অনুসরণ করে বিভিন্ন গণসংগঠন এবং তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী উভয় স্বার্থের প্রেক্ষিতে সংগ্রামের নির্দিষ্ট বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার বদলে কৃষক সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব-ছাত্র সংস্থা প্রভৃতি সমস্ত গণ সংগঠন ও গণ আন্দোলন থেকে সরে এসেছিল। অবশ্য অন্ধ্রে নাগি রেড্ডি প্রভৃতিরা তেলেঙ্গানার লড়াই থেকে শিক্ষা নিয়ে চারু মজুমদারের গণআন্দোলন বর্জনকারী ভ্রান্ত লাইনের বিরোধিতা করেছিলেন এবং গণসংগঠন ও গণআন্দোলনের ভিত্তিতে আন্দোলনের বিকাশ ঘটাবার লাইন তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু পার্টি গঠনের সময়েই চারু মজুমদার-নেতৃত্ব তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতীতে ভারতে কমিউনিস্টদের পরিচালিত গণসংগঠনগুলি বহু ক্ষেত্রেই অর্থনীতিবাদ ও আত্মপ্রতিষ্ঠাবাদের জন্ম দিয়ে গণআন্দোলনকে বিপ্লবের স্বার্থে পরিচালনার বদলে বিপথে চালিত করেছে। কিন্তু সেই যুক্তিতে সব গণসংগঠন ও গণসংগ্রাম বর্জন করার অর্থই দাঁড়ায় সংগ্রামের সমস্ত পদ্ধতিকে ধারাবাহিকভাবে ধৈর্য্য ও কুশলতার সঙ্গে অনুশীলন করতে অস্বীকার করা, যা একধরনের অধৈর্যপনা ও পলায়নী মানসিকতারই প্রকাশ। বস্তুত সেই যুক্তিতে তাহলে তো ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন বিপ্লবের স্বার্থে সংসদকে ব্যবহার করতে গিয়ে সংসদ-সর্বস্বতার কানাগলিতে নিমজ্জিত হয়েছে— এই যুক্তিতে কমিউনিস্ট পার্টিকেই বর্জন করতে হয়!

এর পরিণতি এখানেই শেষ হয় নি, বরং জন্ম দিয়েছে আরও অনেক মৌলিক ভ্রান্তির। চীনে বিপ্লবী যুদ্ধ চলার একটি বিশেষ পর্বে জনগণকে সমবেত করার একটি বিশেষ কৌশল হিসেবে গেরিলা যুদ্ধ ব্যবহৃত হয়েছিল। এদেশে গণসংগঠন ও গণআন্দোলন বর্জন করে এই গেরিলা যুদ্ধকেই সাধারণভাবে জনগণকে সমাবিষ্ট করার একমাত্র কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সেই গেরিলা যুদ্ধ রূপান্তরিত হয়েছিল 'খতম'-এর লাইনে। এবং শেষ পর্যন্ত এই খতমের লাইনই কার্যত হয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্যক্তিহত্যার লাইন— তাদের লড়াইয়ের একমাত্র কৌশল। এর পরিণতিতে তারা ক্রমশ ব্যাপক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। আর এই সুযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাষ্ট্রশক্তি, ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছিল অসংখ্য নকশালপন্থী কর্মীকে— পথে ঘাটে মাঠে, বাড়িতে ও আবাসনের প্রাঙ্গণে, জেলের মধ্যে। সরোজ দত্তের মতো বহু নেতৃস্থানীয় প্রবীণ বিপ্লবীও এই রাষ্ট্রীয় খুনীদের হাত থেকে রেহাই পান নি, এমনকি স্বয়ং চারু মজুমদারের মৃত্যু ঘটেছিল পুলিশি হেফাজতে, সুপরিকল্পিতভাবে তাঁর একান্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে। শেষ পর্যন্ত এই ভ্রান্ত লাইনের পরিণতি দাঁড়িয়েছিল এটাই যে, আধুনিক ভারতের ইতিহাসে ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বিপ্লবের স্বার্থে আত্মোৎসর্গের অভূতপূর্ব ও অনুপম এক অবিস্মরণীয় মহাকাব্য রচিত হলেও, বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বরং এই বিরাট আত্মত্যাগের

Second Time

ব্যর্থতা, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জীবনে অস্তিত্ব বজায় রাখার তীব্র ও কঠিন লড়াই, বিশেষত যুব-মানসে বিরাট এক হতাশার ও রাজনীতি-বিমুখতার জন্ম দিয়েছে।

নকশালপন্থী আন্দোলন আজ বহুধা-বিভক্ত। সত্তরের দশকের আগুন আজ অনেকটাই নিষ্প্রভ। সমাজ-বদলের বিরাট প্রত্যাশা যেভাবে কার্যত চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে এই রাজনীতির মূল দিশাটিকে অক্ষুন্ন রেখে এবং রণকৌশলগত ত্রুটি শুধরে নিয়ে নতুনভাবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলাটা স্বভাবতই খুব কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। যাঁরা সে-চেষ্টায় এখনও ব্রতী রয়েছেন, স্বাভাবিকভাবেই নানাদিক থেকে ব্যর্থতার কারণগুলিকে তাঁরা বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করছেন। জনযুদ্ধ ও এমসিসি গোষ্ঠীর ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত সিপিআই(মাওবাদী) দলটি ছাড়া অধিকাংশ নকশালপন্থী গোষ্ঠী এম-এল পার্টির ব্যক্তি-খতম ও গণলাইন বর্জনের পুরোনো অবস্থান ছেড়ে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার অবস্থান নিয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার সংসদ বয়কটের লাইন ছেড়ে, পরিস্থিতির বিচারের ভিত্তিতে সংসদীয় নির্বাচনে অংশ নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তবে সাথে সাথে সুস্পষ্টভাবে সংসদীয় পথে সমাজ-বদলের লাইনেরও বিরোধিতা করছে। সাংগঠনিকভাবে দু-একটি বাদে এদের অধিকাংশেরই তেমন সাংগঠনিক শক্তি বা অনুশীলনের ক্ষেত্র এখনও পর্যন্ত নেই। ফলত, ভারতীয় বিপ্লবের সঠিক পথ অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় এই গোষ্ঠীগুলি নিজ নিজ চিন্তা ও সামর্থ্য অনুসারে সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল-ভিত্তিক সঠিক ও কার্যকর একটি লাইন গড়ে তোলার দুরূহ কাজটি বাস্তবত অধরাই রয়ে গেছে।

'মাওবাদ'

এছাড়া রয়েছে জনযুদ্ধ-এমসিসি-র ঐক্যের ভিত্তিতে কয়েক বছর আগে গড়ে-ওঠা সিপিআই(মাওবাদী) এবং এধরনের আরও দু-একটি গোষ্ঠী, যারা এখনও সিপিআই(এম-এল)-এর পুরোনো অবস্থানেই মূলত রয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে সীমিতভাবে দাবি-দাওয়া-ভিত্তিক গণআন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি উল্লেখ এদের রণনীতি ও রণকৌশলগত গৃহীত সিদ্ধান্তে থাকলেও,[৬] এরা এখনও সে সবের উপর তেমন গুরুত্ব না দিয়ে গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গড়ে সশস্ত্র কৃষিবিপ্লব গড়ে তোলার কর্মসূচিকেই মূল গুরুত্ব দিয়ে চলেছে। সংসদীয় নির্বাচনে স্থায়ীভাবে বয়কটের লাইন এদের কাছে রণকৌশল নয়, বরং রণনীতির প্রশ্ন। সত্তর দশকের নকশালপন্থী আন্দোলনের বিরাট বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেবার কথা বললেও মূলত পুরোনো লাইনের ধারাবাহিকতাতেই এদের অবস্থান, তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সফল তেলেঙ্গানার লড়াইয়ের শিক্ষা এদের কাছেও মূল গুরুত্ব পায় নি। তবে সাংগঠনিক শক্তির বিচারে নিঃসন্দেহে ২০০৪ সালে সংগঠিত সিপিআই(মাওবাদী) পার্টিটিই এ মুহূর্তে এদেশে সবচেয়ে শক্তিশালী নকশালপন্থী গোষ্ঠী।

এরাই বস্তুত চারু মজুমদারের নেতৃত্বাধীন সিপিআই(এম-এল) পরিচালিত নকশালবাড়ি আন্দোলনের মূল ধারাকে বহন করে চলেছে। তাদের সেই পূর্বসূরীদের মতো তারাও তাদের সমস্ত কর্মসূচি তথা কর্মকাণ্ডকে বিন্যস্ত করেছে মাও-নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক বর্জিত বর্তমান যুগ সম্পর্কিত একটি অতি 'বাম' ভ্রান্ত ধারণার উপর। বিগত শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যখন সোভিয়েত ও চীনের পার্টির মধ্যে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যসম্পন্ন বিরাট এক মতাদর্শগত বিতর্ক চলছিল, তখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে স্তালিন-কৃত বর্তমান যুগের চরিত্রায়ন (*'বর্তমান যুগ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ'*, আর *'লেনিনবাদ হচ্ছে এযুগের মার্কসবাদ'*) নিয়ে কোনো মতদ্বৈততা ছিল না। কিন্তু ঠিক ওই সময়েই চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নেপথ্যে চীন বিপ্লব তথা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অবিসংবাদী নেতা মাওসেতুং-এর জয়ধ্বনি তুলতে তুলতেই একটি 'বাম' লাইন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। বর্তমান যুগ সম্পর্কে বিরাজমান ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে এরা ঘোষণা করে : বর্তমান যুগটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের সামগ্রিক ধ্বংসের আর সমাজতন্ত্রের বিজয় অর্জনের যুগ, আর মাও সেতুঙ চিন্তাধারা হচ্ছে এযুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। চীনের পার্টির নবম কংগ্রেসে (১৯৬৯) গৃহীত পার্টি-সংবিধানে পর্যন্ত এই বক্তব্য ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু খুব শিগগিরই মাও-এর উদ্যোগে এই আপাত-'বাম' কুচক্রীদের স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যায় এবং ১৯৭১-এ লিন পিয়াওকে এদের প্রধান নেপথ্য মদতদাতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভারতের সিপিআই(এম-এল) কিন্তু বর্তমান যুগ সম্পর্কে সেই অবাস্তব চরিত্রায়নই অনুসরণ করতে থাকে। এরপর মাও-এর নেতৃত্বে চীনের পার্টির দশম কংগ্রেসে (১৯৭৩) গৃহীত পার্টি-সংবিধানেও পূর্বোক্ত ভ্রান্ত বক্তব্য বাদ দেওয়া হয়, রাজনৈতিক রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে বর্তমান যুগ সম্পর্কে পুরোনো মূল্যায়নের (*'লেনিনবাদ হচ্ছে এযুগের মার্কসবাদ'*) পুনরাবৃত্তি করা হয়।

কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে এটাই যে, তখনও পর্যন্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বোচ্চ বিকাশ হিসেবে সব পক্ষই তুলে ধরতো 'মাও সেতুঙ চিন্তাধারা'-কেই, 'মাওবাদ' কথাটি তখনও পর্যন্ত সেই স্থান দখল করে নি। অতীতে চীন বিপ্লবের সময় থেকেই চীনের পার্টিতে 'মাওবাদ' কথাটি ব্যবহারের একটি প্রবণতা ক্বচিৎ কখনও প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু স্বয়ং মাও সেতুঙ দৃঢ়ভাবে তা প্রতিহত করেছেন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে কয়েকটি 'উগ্র বাম' রেড গার্ড গ্রুপ নিজেদেরকে

Second Time

'মাওবাদী' বলে অভিহিত করে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তুলে দিয়ে তার বদলে একটি 'মাওবাদী' পার্টি গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। কিন্তু মাও-নেতৃত্ব তার বিরোধিতা করে ক্ষতিকর কার্যকলাপের জন্য তাদেরকে 'প্রতিবিপ্লবী' বলে চিহ্নিত করে, এবং চক্রান্তকারী কয়েকজন নেতাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[৭] এর পর মাও-এর জীবদ্দশায় 'মাওবাদ' কথাটি আর সামনে আসে নি। এ প্রসঙ্গে খেয়াল করা দরকার, চীনের নবম কংগ্রেসে লিন পিয়াওপন্থীদের ভ্রান্ত অবস্থানের প্রভাবে এদেশে চারু মজুমদার নেতৃত্ব মাও সেতুঙ চিন্তাধারাকে এযুগের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বলে অভিহিত করলেও 'মাওবাদ' কথাটি কিন্তু ব্যবহার করেন নি। কিন্তু ষাটের দশকের আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত বিতর্কের ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রুশ্চভপন্থী দলের বিরোধিতা করে যে সব নতুন শক্তির উদ্ভব ঘটেছিল, মাও-এর মৃত্যু-পরবর্তীকালে চীনের অধঃপতনের প্রেক্ষিতে তারা অনেকেই আশির দশক থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে '*বিপ্লবী আন্তর্জাতিক আন্দোলন*' (Revolutionary Internationalist Movement বা RIM) গড়ে তুলে জোটবদ্ধ হবার প্রক্রিয়া শুরু করে। সেই প্রক্রিয়াতেই ক্রমে ক্রমে 'মাওবাদ' কথাটি 'মাও সেতুঙ চিন্তাধারা'-র স্থান দখল করতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে এই প্রবণতাটিই এদের মধ্যে একটি সাধারণ সংজ্ঞায় পরিণত হয়। প্রথম দিকে পেরুর গঞ্জালেসের নেতৃত্বাধীন 'শাইনিং পাথ' ও ফিলিপাইনের মাওবাদী পার্টি, এবং পরবর্তীকালে নেপালের মাওবাদী পার্টির তৎপরতা ও প্রাথমিক সাফল্য এই প্রবণতাটিকে জোরদার করে তোলে। 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুং চিন্তাধারা'-র বদলে কেন 'রিম' 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ' বলছে, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯৭৩-এ তাদের প্রাসঙ্গিক ঘোষণাপত্রে বলেছিলঃ ''মাওবাদ শুধু মাও-এর মহান অবদানসমূহের সার-সংকলন নয়। এটা হচ্ছে নতুন ও উচ্চতর স্তরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বাঙ্গীন ও সর্বাত্মক বিকাশ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ হচ্ছে একটি অখণ্ড সমগ্র; এটা হচ্ছে কার্ল মার্কস, ভি আই লেনিন ও মাও সেতুং কর্তৃক সর্বহারাশ্রেণীর মতাদর্শের নতুন নতুন পর্যায়ে মার্কসবাদ থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং তা থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ-এর সমন্বয় ও বিকাশ... সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য একটি প্রাণবন্ত ও বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ...।''

একথা কিন্তু কোনো মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই অস্বীকার করেন না যে, মাও সেতুং তাঁর অসংখ্য তাত্ত্বিক অবস্থান ও কর্মধারার মধ্যে দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অসাধারণ বিকাশ ঘটিয়েছেন। লেনিন সফল বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এমন একটি স্বাধীন দেশে, সমাজবিকাশের ধারায় যে দেশটির মূলত পুঁজিবাদে উত্তরণ ঘটে গেছে, এবং সেকারণেই চরিত্রের বিচারে যে বিপ্লব ছিল সমাজতান্ত্রিক। আর মাও যে চীনে সফল বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেটি মূলত ছিল একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ, ফলত বিপ্লবের স্তর ছিল নয়া-গণতান্ত্রিক, লেনিন যার প্রাথমিক তাত্ত্বিক সূত্রায়নের ইঙ্গিত দিলেও বাস্তবে যার তত্ত্ব ও অনুশীলনের রূপরেখাটি রচনা করতে হয়েছিল মাওকেই। সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রুশ্চভীয় প্রতিবিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বিপ্লবের পরেও একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে সর্বহারা পার্টির মধ্যেই ঘাপটি মেরে থেকে ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়াদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চক্রান্ত প্রতিহত করার জন্য বিপ্লবের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আবশ্যিকতার তত্ত্বটিও রূপায়িত করেছিলেন মাও-ই। এবং তার বাস্তব অনুশীলনের পদ্ধতি হিসেবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তত্ত্বটিরও প্রণেতা তিনিই, যদিও শেষ পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টা তিনি সফল করতে পারেন নি। তাছাড়া তত্ত্বের ক্ষেত্রেও, তিনি বিকাশ ঘটিয়েছিলেন দ্বান্দ্বিকতার তত্ত্বের এবং জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের ও তার সঠিক সমাধানের তত্ত্বের। তাঁর এই সব অবিস্মরণীয় অবদানের জন্যই সারা দুনিয়ার বিপ্লবীরা 'মাও সেতুঙ চিন্তাধারা'কে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উচ্চতর স্তরে বিকাশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু যুগটি যেহেতু অপরিপর্তিতই রয়ে গেছে, তাই তাকে 'মাওবাদ' হিসেবে অবহিত করে তাঁর চিন্তাধারার ও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার ধৃষ্টতা দেখাবার প্রয়োজন অনুভব করে নি। অন্যদিকে, মাওবাদীদের উপরে উদ্ধৃত আকর্ষক বাক্যসমূহের আড়ালে যে তাত্ত্বিক অবস্থানটি নিহিত রয়ে গেছে, নিঃসন্দেহে সেটি মতাদর্শগতভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসেতুং চিন্তাধারার মৌলিকভাবে বিরোধী। কারণ, প্রথমত, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাথমিক ধারণা অনুসারে, 'বাদ' (ism)-এর ধারণাটি যুগের ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। স্তালিন পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় সাম্রাজ্যবাদের যুগে, পুঁজিবাদের চরম অবক্ষয়ের যুগে রূপান্তরের প্রেক্ষিতেই তাই 'মার্কসবাদ'-এর 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ'-এ উত্তরণকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সেই যুগের এখনও অবসান ঘটে নি। মাও ও তাঁর নেতৃত্বাধীন চীনের পার্টির সিদ্ধান্ত ছিল এটাই, এবং সেকারণে সেই পার্টির দশম কংগ্রেসে পুনর্বার গুরুত্ব দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ''*লেনিনবাদ হচ্ছে এযুগের মার্কসবাদ''।* মাওবাদীরা 'মাওবাদ'কে এ যুগের মার্কসবাদ হিসেবে তুলে ধরে আসলে মাও-এর তথা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক ধারণারই বিরোধিতা করছেন। দ্বিতীয়ত, এই নিবন্ধের প্রথমেই বলেছি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে এটা যে, একটি দেশের নির্দিষ্ট সমাজ-বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই কেবল সেদেশে সমাজ-বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল সঠিকভাবে নির্ধারিত হতে পারে— বাইরে থেকে তা ঠিক করে দেওয়া যায় না; এবং সেই বাস্তব অবস্থার সঙ্গেই বিষয়ীগত প্রস্তুতির সার্থক সমন্বয়ই বিপ্লবের বিজয়কে সুনিশ্চিত

Second Time

করতে পারে। কিন্তু মাওবাদীরা এক ধাক্কায় সমগ্র দুনিয়াতেই, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে, বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিটি দেশের সুনির্দিষ্ট সমাজ-পরিস্থিতির ধৈর্যশীল ও কষ্টকর অনুধাবনের কাজটাকেই নস্যাৎ করে দিয়েছেন। একই সঙ্গে প্রতিটি দেশই এই মুহূর্তে সশস্ত্র জনযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত— এই নিদান হেঁকে সমাজ-বিপ্লবকে একটি সরল ফরমুলায় পর্যবসিত করার ব্যবস্থা করেছেন, যা আবার, শেষ বিচারে, সেইসব দেশে প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলনের বিকাশকে ব্যাহত করছে। তৃতীয়ত, আগেই আমরা সমাজ-বিপ্লব সমাধা করার লক্ষ্যে সংগ্রামের আইনি-বেআইনি সমস্ত ধরনের পদ্ধতিকে, এমনকি সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনোরকম মোহকে প্রশ্রয় না দিয়েও প্রয়োজনমতো নির্বাচনে অংশগ্রহণের আবশ্যিকতা সম্বন্ধে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক শিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করেছি। সেই আলোচনাকে আর দীর্ঘায়ত না করে (কেননা মার্কস থেকে শুরু করে মাও পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ের পথিকৃৎ ও শিক্ষকদের রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক অজস্র উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা এই পত্রিকা-সহ অনেক পত্রিকা ও গ্রন্থে অসংখ্যবার করা হয়েছে, আবার তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই) স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে, মাওবাদীরা তাদের তাত্ত্বিক অবস্থান ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক শিক্ষার বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন। কাজেই, এক কথায়, এই সিদ্ধান্তে না উপনীত হয়ে কোনো গত্যন্তর থাকে না যে, 'মাওবাদ'-এর ধারণাটিকেই তার ধারক ও বাহকেরা মার্কস্বাদ-লেনিনবাদের বিরুদ্ধে স্থাপিত করেছেন; ফলত, 'মাওবাদ' অর্থই হয়ে দাঁড়াচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিকাশ নয়, বরং মৌলিকভাবে তার থেকে বিচ্যুতি।

চীন বিপ্লবের পথ : তৃতীয় পর্ব

আমাদের দেশে এই মুহূর্তে সিপিআই(মাওবাদী) দলটি এই 'মাওবাদ'-এর, এবং একই সাথে চারু মজুমদারের নেতৃত্বাধীন সিপিআই(এম-এল) পরিচালিত নকশালবাড়ি আন্দোলনের মূল ধারাকেই বহন করে চলেছে। প্রথমে জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর সাথে পার্টি ইউনিটি গোষ্ঠীর এবং ২০০৪ সালে এমসিসি গোষ্ঠীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই দলটি গঠিত হয়। তাদের সেই পূর্বসূরীদের মতো, এবং 'মাওবাদ'-এর আন্তর্জাতিক অবস্থান থেকে তারাও তাদের সমস্ত কর্মসূচি তথা কর্মকাণ্ডকে বিন্যস্ত করেছেন আমাদের পূর্ব-আলোচিত মাও-নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক বর্জিত বর্তমান যুগ সম্পর্কিত ভ্রান্ত 'বাম' ধারণাটির উপর— যে ধারণা অনুসারে, বর্তমান যুগ পরিবর্তিত, এবং লেনিনবাদ নয়, 'মাওবাদ' এই নতুন যুগের মার্কস্বাদ।

'মাওবাদীরা' তাঁদের রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কিত দলিলে বলেছেন, ভারত একটি আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ, প্রাক্-বিপ্লবী চীনের সঙ্গে মৌলিক সাদৃশ্যের কারণে চীন বিপ্লবের পথই হবে ভারতীয় বিপ্লবের পথ। এরকম একটি দেশে, যেখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার আছে নামমাত্র, সেখানে সর্বহারার পার্টিকে '*শুরু থেকেই*' জনগণকে, অর্থাৎ বিশেষত কৃষকদেরকে সশস্ত্র সংগ্রামে সমবেত করতে হবে, এবং তা করতে হবে পিছিয়ে থাকা গ্রামাঞ্চলকে মূল কর্মক্ষেত্র করে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মাধ্যমে। 'মাওবাদীরা' আইনি-সহ বিভিন্ন গণসংগ্রামকে কিন্তু চারু মজুমদারপন্থী নকশাল-পন্থীদের মতো পুরোপুরি বাতিলও করেন নি, বরং সেজন্য তাঁদের মৃদু সমালোচনাও করেছেন, এবং আপ্তবাক্যের মতো মাঝেমাঝেই ''অন্যান্য গণসংগ্রামও আমাদের করতে হবে'' বলে ঘোষণাও করেছেন, কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে এবং বাস্তবত সে পথের বিরোধিতাই করছেন। মাও কিন্তু চীনবিপ্লব পরিচালনা করতে গিয়ে বারবার বলেছেন, সশস্ত্র সংগ্রামের উপর জোর দেওয়া মানে কোনোক্রমেই আইনি-সহ অন্যান্য পন্থাকে অবহেলো করা নয়, অন্যান্য পন্থার সঙ্গে সমন্বয় না ঘটাতে পারলে সশস্ত্র সংগ্রাম কখনোই বিজয় অর্জন করতে পারবে না।

মার্কস থেকে মাও তাঁদের বিভিন্ন লেখায় আর একটি কারণেও গণসংগঠন ও গণ-আন্দোলনের উপর জোর দিয়েছিলেন। কমিউনিস্টদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আশু স্বার্থভিত্তিক গণআন্দোলন সঠিক পথে পরিচালিত হলে জনগণের শ্রেণীচেতনা বাড়িয়ে তোলে, বিপ্লবী লড়াইয়ের জন্য তাদের প্রস্তুতি ও আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তোলে। সবচেয়ে বড়ো কথা, মাও যেমন বারবার জোর দিয়ে বলেছেন, বিপ্লবের সাফল্য ও ধারাবাহিকতার জন্য কমিউনিস্টদের পক্ষে একান্ত আবশ্যিক হচ্ছে 'জনগণের কাছ থেকে নিয়ে আবার জনগণের মধ্যেই' যাবার লাইন, অর্থাৎ গণলাইনের (massline) পদ্ধতি ধৈর্য সহকারে অনুসরণ করা ; এবং একমাত্র জনগণের সমস্ত ধরনের আন্দোলনের মধ্যে থেকেই সেই লাইনের অনুশীলন করা সম্ভব। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৩ পর্যায়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পাঠানো বিভিন্ন পরামর্শগুলির, কিংবা মাওয়ের প্রাসঙ্গিক সময়কালের রচনাগুলির তন্নিষ্ঠ অধ্যয়ন থেকেই ধরা পড়বে, 'মাওবাদীরা' যেমন দাবি করছেন— যদিও তা পুরোপুরি ঠিক নয়— ভারতে গণআন্দোলন বা শ্রমিকআন্দোলন করার কোনোরকম আইনি সুযোগ নেই, চীনে বিপ্লবী যুদ্ধ চলাকালে তার চেয়েও খারাপ অবস্থা ছিল। তবু সেখানে কমিউনিস্টরা এমনকি প্রতিবিপ্লবী কুয়োমিন্টাংদের সংগঠনের মধ্যে ঢুকেও সে সব আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। অতীতে 'মাওবাদীরা' এদেশে অন্ধ্রপ্রদেশে ছাত্র-যুবক, শিল্পী-সাহিত্যিক, শ্রমিক, এমনকি মানবাধিকার-কর্মীদের মধ্যে, বিরাট সংগঠন গড়ে তুললেও, সেগুলি ছিল প্রায়

Second Time

সিপিআই(এম)-এর নিয়ন্ত্রিত গণসংগঠনগুলির মতোই, পার্টির প্রায় প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধীন। এবং সম্প্রতিকালেও লালগড়ে মূলত জনগণের উদ্যোগে ও তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলনকে তাঁরা, নিজেদেরই প্রকাশ্য স্বীকৃতি অনুসারে, নিজেদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত অর্থে গণউদ্যোগ গড়ে তোলার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার পরিচয় তাই তাঁরা দিতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, তাঁদের রণনীতি ও রণকৌশল সংক্রান্ত দলিলে তাঁরা গণআন্দোলন বলতে বুঝেছেন, শ্রমিক-কৃষক-সহ ও অন্যান্য স্তরের মেহনতি মানুষদের আন্দোলনগুলিকে মূলত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সহায়ক হিসেবে। ফলত এই সব আন্দোলন-গুলিতে সমর্থন বা ভয়-ভীতিতে জনসাধারণ কম-বেশি সমবেত হলেও, সেগুলির মধ্যে দিয়ে গণলাইনের মাও-বর্ণিত অনুশীলন ঘটে নি, তাই জনগণের শ্রেণীচেতনা বাড়িয়ে তোলার, বা বিপ্লবী লড়াইয়ের জন্য তাদের প্রস্তুতি ও আকাঙক্ষা বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে, শেষ বিচারে, এগুলির পক্ষে প্রত্যাশিত ভূমিকা নেওয়া সম্ভব হতে পারে না।

'মাওবাদীদের' বিচারে, ভারতের বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি প্রাক্-বিপ্লব চীনের মতো। তাই তাঁদের মূল রণনীতি চীন বিপ্লবের মতো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত কি আদৌ বাস্তবসম্মত? কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও, এই দুই অর্থনীতি সম্পর্কে তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের মূলত সাদৃশ্যের পূর্ব-অনুমানটিকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। আর *'চীনে কেন রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকে থাকতে পারে'*— সে সম্পর্কে মাও যে দু'টি মৌলিক কারণের কথা বলেছিলেন (এলাকাভিত্তিক প্রায়-বিচ্ছিন্ন কৃষি-অর্থনীতি এবং প্রভাবাধীন এলাকাগুলিকে ভাগ করে নেবার সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়া), ভারতে সেই কারণ দু'টি মূলত খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাহলে কীভাবে চীন বিপ্লবে অনুসৃত রণনীতি এখানে মূলত প্রযুক্ত হতে পারে!

মাও বলছেন : চীনে সেখানেই প্রথম রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকে থাকতে পারে এবং দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে গণসংগ্রাম চলেছে, শ্রমিক-কৃষকরা বারবার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লড়াই চালিয়েছে। এবং চীনের মতো দেশে, যেখানে যুদ্ধই লড়াইয়ের মূল রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানেও যুদ্ধ-পূর্ব সময়কালের গণসংগঠন ও গণআন্দোলন-গুলি যুদ্ধ শুরু হবার 'প্রস্তুতি'র কাজ করে। *এটা খুবই স্পষ্ট যে, (সেই) প্রস্তুতিপর্বে গণআন্দোলন হচ্ছে সংগ্রামের প্রধান রূপ আর গণসংগঠন হচ্ছে জনগণকে সংগঠিত করার সংগঠনের প্রধান রূপ।* অথচ 'মাওবাদীরা' তাঁদের পূর্বোল্লিখিত দলিলে বলছেন : গণসংগঠন ও গণআন্দোলনগুলি ধীরে ধীরে সশস্ত্র লড়াইয়ের দিকে যেতে পারবে— এই চিন্তা ভুল। সত্যিই এটা একটা ট্র্যাজেডি যে, যাঁরা এদেশে নিজেদেরকে 'মাওবাদী' বলে দাবি করেন, তাঁদের কাছেই মাওয়ের এই সুস্পষ্ট বক্তব্য স্পষ্ট হয় নি!

মাও আরও বলছেন : *চীনে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কোনো গণতন্ত্র নেই, আছে সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো স্বাধীনতা নেই... ব্যবহার করার মতো কোনো পার্লামেন্ট নেই এবং শ্রমিকদের ধর্মঘটে সংগঠিত হবার কোনো আইনি অধিকার নেই।* এই পটভূমিকাতেই তিনি চীন বিপ্লবের রণনীতি প্রণয়ন করেছিলেন। এই বর্ণনা কি ভারতের সম্পর্কে মূলত খাটে? আন্দোলনে বক্তৃতা করতে গিয়ে কী কী গণতান্ত্রিক অধিকার এদেশে কার্যকর নয় সেকথা অবশ্যই বলতে হবে, কিন্তু তাই বলে ''*কোনো গণতন্ত্র নেই*'' বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে এটাই প্রমাণিত হবে যে, প্রাক্-বিপ্লব চীন সম্পর্কে আমাদের সামান্যতম ধারণা নেই, আমরা সারা পৃথিবীর খোঁজ রাখি না। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের তুলনায় আমরা সুনিশ্চিতভাবেই বেশি গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করি, বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে কে বা কারা আমাদের শাসন করবে— পাঁচ বছর অন্তর ভোটের মাধ্যমে আমরাই সেটা অনেক পরিমাণে ঠিক করে দিতে পারি। ১৯৭৭-এর নির্বাচনে ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটাবার মতো, কিংবা সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম)-এর 'অক্ষয়' শাসনের অবসান ঘটাবার মতো প্রায়-অসম্ভব কাজটি এদেশের আপামর জনসাধারণই ঠিক করে দিতে পেরেছেন— স্বয়ং 'মাওবাদী' নেতা কিষেণজী যাকে প্রকাশ্যে স্বাগত জানিয়েছেন। এরও মূল চাবিকাঠিটি কিন্তু রয়েছে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণেরই হাতে। তাহলে? কীভাবে প্রাক্-বিপ্লব চীনের পরিস্থিতির সঙ্গে ভারতের পরিস্থিতি একই রকম বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যাবে?

এই প্রসঙ্গেই সংসদীয় নির্বাচন নিয়ে 'মাওবাদীদের' অবস্থান সম্পর্কে আর একটু বলা দরকার। তাঁরা তাঁদের দলিলে বলছেন: মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ অনুসারে, *নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা বয়কটের প্রশ্নটি রণকৌশলের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের আবির্ভাবের পর, সংসদীয় পথ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ যখন আধুনিক সংশোধনবাদীদের রণনীতি হয়ে উঠেছে, তখন এই প্রেক্ষিতে বিষয়টিকে আমরা আর রণকৌশল বলে ছেড়ে দিতে পারি না। কাজেই, এ কথা বলা ভুল হবে যে, দেশের বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সাধারণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হলে এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের রণনীতির পক্ষে সহায়ক হলে অন্য সব রণকৌশলের মতো এই রণকৌশলকেও আমরা ব্যবহার করতে পারি।* কারণ, তাঁদের মতে, স্পষ্টত তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করছেন যে, তাঁরা ধ্রুপদী মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী অবস্থানের বিপরীত কথা বলছেন। তাঁদের মতে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা উঠতে পারে শুধু সেইসব দেশে,

Second Time

যেখানে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে। বস্তুত 'মাওবাদীদের' এই তত্ত্ব 'বাম' অবস্থান থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও বিপ্লবী অনুশীলনের অভিজ্ঞতার এক ধরনের 'সংশোধন'-প্রচেষ্টামাত্র। তাঁরা আরও দাবি করছেন যে, (এক) *বিপ্লবের বিষয়গত শক্তি এখন দুর্বল, সশস্ত্র বিপ্লব গড়ে তোলার মতো অবস্থায় নেই, তখন নির্বাচনী লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে জনগণের শক্তি ও চেতনা বাড়িয়ে যেতে হবে*— এই বক্তব্য ভুল; কেননা নির্বাচনী লড়াই বিপ্লবের বিষয়গত শক্তির বিকাশে আদৌ সহায়তা করে না, বরং সংসদ-সর্বস্বতার মধ্যে বেঁধে ফেলে এবং বিপ্লবের কঠিন ও কষ্টকর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়; (দুই) আর *নির্বাচন সম্পর্কে জনগণের মোহ ভিতর থেকে ভাঙার জন্যই তাতে অংশ নেওয়া উচিত*— এই বক্তব্য আরও জঘন্য ও বিপজ্জনক; কেননা এমনিতেই জনগণের এ-সম্পর্কে তেমন কোনো মোহ নেই। মুস্কিল হচ্ছে, এই দু'টি বক্তব্যই যে 'ভদ্রলোক'-এর, তাঁর নাম লেনিন; তাঁর মতে, তাঁদের দেশ রাশিয়াতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকাশ অসম্পূর্ণ, তবু তিনি প্রয়োজনবোধে নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিপ্লবী লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অবস্থানের পক্ষে বারবার বিতর্ক চালিয়ে গেছেন। আর মাও-এর এ-সম্পর্কিত বক্তব্য আমরা আগেই দেখেছি। এমনকি 'মাওবাদীরা' যে ক্রুশ্চভীয় সংশোধনবাদের আবির্ভাবের প্রসঙ্গ তুলেছেন, তারপরেই মাও-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত বিতর্কে চীনের পার্টির স্পষ্ট বক্তব্য ছিল: পার্লামেন্ট থাকলে প্রয়োজনবোধে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত। ফলত 'মাওবাদীদের' নির্বাচনী অবস্থান একান্তভাবেই তাদের নিজস্ব 'সংশোধনবাদী' অবস্থান, মাওসেতুং চিন্তাধারার সঙ্গেও তার কোনো সম্পর্ক নেই। আগেই বলেছি, ভারতের মানুষ ১৯৭৭-এ নির্বাচনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিলেন, বা সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সিপিএম অপশাসনের অবসান ঘটিয়েছেন। তাহলে কেন কিষেণজীরা অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে এই প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করতে পেরেছেন? কীভাবেই বা গোপন 'আঁতাত' গড়ে মাওবাদীরা অতীতে অন্ধ্রপ্রদেশে নাইডু সরকারকে হটাবার, বা বিহারে লালুপ্রসাদকে এবং ঝাড়খণ্ডে শিবু সোরেনকে জেতাবার প্রচেষ্টা চালান? এগুলি কি দ্বিচারিতা নয়?

সিপিআই(মাওবাদী) দল এখন তাঁদের নিজস্ব পন্থায় বিপ্লবের জন্য বেছে নিয়েছেন ভারতের মধ্যাঞ্চলের আদিবাসী-অধ্যুষিত পাহাড়ি ও জঙ্গল এলাকাগুলিকে। এই মুহূর্তে ভারতের রাজনীতি অনেকাংশেই আলোড়িত হচ্ছে ভারতের মধ্যাঞ্চলের মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড়-মহারাষ্ট্র-অন্ধ্র থেকে পূর্বাঞ্চলের ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড-বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এই এলাকাগুলিকে কেন্দ্র করে। এই অঞ্চলেই হাজার বছর ধরে বাস করে যারা, সেই আদিবাসী, বনবাসী বা গিরিজন— যে নামেই ওদের ডাকুন না কেন— সেই পঞ্চাশের দশক থেকে, এদেশে পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু হবার সময় থেকেই সবচেয়ে বিপন্ন, সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত, উচ্ছিন্ন ও নির্যাতিত হয়েছে এরাই। দেশে উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ চললেও, কার্যত তার সামান্য আলোও তাদের জীবনে প্রায় পৌঁছোয় নি, বরং বাঁধ, কারখানা, রেলপথ আর পাকা রাস্তা যতো বেশি বেড়েছে, ততোই তাদের বিপদ বেড়েছে। 'উন্নয়ন'-এর মর্মার্থ তাদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে— উচ্ছেদ। জীবিকা থেকে, জীবনধারনের সাবেকি পদ্ধতি থেকে, দেশজ সংস্কৃতি থেকে— উচ্ছেদ। বনভূমির উপর তাদের যুগযুগান্তের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে ছলে-বলে-কৌশলে। জল, জমি, নদী, মাঠ, জলাশয় জাতীয় সামাজিক সম্পত্তির উপর যেটুকু এক্তিয়ার তাদের ছিল, তা-ও কেড়ে নেবার চক্রান্ত চলছে— কখনও খনিশিল্প বা নানারকম 'উন্নয়নমূলক' কর্মসূচির অজুহাতে, এবং এই মুহূর্তে আরও ব্যাপক ও তীব্রভাবে বিশেষ আর্থিক অঞ্চল (*সেজ*) প্রতিষ্ঠার তাগিদে। সমগ্র আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি আজ পরিণত হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের ধারাবাহিক লুণ্ঠন ও ধ্বংসের এক একটি নির্মম দৃষ্টান্তে। সেখানে রাষ্ট্র ও সরকারের সমস্ত বিভাগ এবং সরকারি ও সংসদীয় বিরোধী দলও অন্ধ ও বধির হয়ে রয়েছে এদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা এবং বঞ্চনার ব্যাপারে— তাদের বিবেক, মানবিক চেতনা এবং মৌলিক অবস্থান নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে মুষ্টিমেয় বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠী ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মুনাফার স্বার্থে ও প্রণোদনায়।

এবং এই আক্রমণের ব্যাপকতা দিন দিন বাড়ছে। ক্রমশ দেয়ালে পিঠ-ঠেকে-যাওয়া আদিবাসীরা অস্তিত্বের তাগিদে বাধ্য হচ্ছেন রুখে দাঁড়াতে, সংঘবদ্ধ হতে, প্রাণপণ শক্তিতে প্রতি-রোধের লড়াই তীব্রতর করে তুলতে। মনে রাখা দরকার, আমাদের দেশের আদিবাসীদের রয়েছে মরণপণ সংগ্রামের হাজার হাজার বছরের দীর্ঘ ঐতিহ্য। লড়াইয়ের সেই আগুন নিভে যায় নি কোনো দিন কোনোভাবেই। গত কয়েক দশক ধরে তাদের জীবন ও জীবিকার উপর সরকারি মদতপুষ্ট তথাকথিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলির আক্রমণ যখন তীব্রতর হয়ে উঠেছে, তখন সেসবের বিরুদ্ধে ব্যাপক সব গণআন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটেছে, আর তার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে লড়াইয়ের সামনের সারিতে থেকেছে তারাই— দল্লী-রাজহরা, নর্মদা, রায়গড়, নিয়মগিরি প্রভৃতি তারই দৃষ্টান্ত। আদিবাসীদের সমস্ত প্রতিবাদ, আন্দোলন ও প্রতিরোধও প্রায় স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় ও কোম্পানিগুলির সন্ত্রাসী বুটের তলায়। অথচ সেগুলির অধিকাংশই ছিল মূলত গণচরিত্রবিশিষ্ট ও অহিংস। আবার সেগুলির পাশাপাশি অতীতকাল থেকেই গড়ে উঠেছে

Second Time

হিংসাশ্রয়ী লড়াইগুলিও। এই সব লড়াইগুলি, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সুনিশ্চিতভাবেই ন্যায়সঙ্গত এই বিদ্রোহগুলি, আজ এক উচ্চতর মাত্রা পেয়ে গেছে। 'মাওবাদীরা' বিগত দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে এই এলাকাগুলিতে তাঁদের নিজস্ব কর্মসূচি অনুসারে, রণনীতি ও রণকৌশল অনুসারে দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী যুদ্ধের জন্য সক্রিয় সংগঠন ও প্রস্তুতি গড়ে তুলেছেন। বেশ কিছু অঞ্চলে তাঁরা কার্যকর নিয়ন্ত্রণও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেছে রাষ্ট্রশক্তি। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ-প্রণোদিত শোষণপ্রক্রিয়া সংকটে পড়েছে মাওবাদীদের ও আদিবাসীদের প্রতিরোধের ফলে। ফলত রাষ্ট্রও সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমস্ত শক্তি নিয়ে। পরিণতিতে এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে চলছে যুদ্ধ। চলছে বিরাট এক সামরিক অভিযান— 'অপারেশন গ্রীন হান্ট', জারি হয়েছে চরম কালা আইন— ইউএপিএ।

আমরা আগেই দেখেছি, 'মাওবাদীরা' অন্তত তাত্ত্বিকভাবে গণআন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করছেন, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে, অন্তত প্রথম দিকে ছত্তিশগড় অঞ্চলে, অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে আদিবাসীদের সংগঠিত করে কিছু আন্দোলনও করেছেন। কিন্তু তার উপর সামগ্রিকভাবে জোর দেওয়া হয় নি। জোর দেওয়া হয়েছে যার উপর, সেটি সেই পুরোনো ব্যক্তিহত্যার লাইন। মূলত গণআন্দোলন-বিচ্ছিন্ন এই লাইন অনেক বেশি প্রকটভাবে অনুসৃত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে— লালগড় প্রভৃতি এলাকায়। লালগড়ে পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের যে গণজাগরণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিচুতলা থেকে মাথা তুলেছিল ও ব্যাপক মানুষের সহানুভূতি পেয়েছিল, সেই আন্দোলনকেও তাঁরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন, আন্দোলন তার ফলে ব্যাপক জনসমর্থন অনেকটাই হারিয়েছে। সেখানে নিঃসন্দেহে তাঁদের পিছনে সরকারি অবহেলায় ক্ষুব্ধ এবং পুলিশি অত্যাচারে বিপন্ন ও ক্রুদ্ধ আদিবাসীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের সমর্থন আছে; আবার সবাই-ই যে স্বেচ্ছায় তাঁদের সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছে, ভয়-ভীতি ও বাহুবলের কারণে নয়— এমন কথাও মনে করার বাস্তব ভিত্তি নেই। শাসক দল সিপিআই(এম) ছাড়াও তাঁদের অন্যান্য বিরোধী রাজনীতির লোকদের, এমনকি বিভিন্ন নকশালপন্থীগোষ্ঠীরও, কণ্ঠরোধের প্রক্রিয়া চলছে অব্যাহতভাবে। আর চলছে ধারাবাহিক ব্যক্তিহত্যার জঘন্য এক প্রক্রিয়া। তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য পুলিশ ও আধা-সামরিকবাহিনী ছাড়া সিপিআই(এম) কর্মী বা সমর্থকেরা এবং পুলিশের চর হিসেবে চিহ্নিতরা। নিহতরা অধিকাংশই কিন্তু শ্রেণীগতভাবে শোষিতশ্রেণীর। সত্তরের দশকে নকশালপন্থীরাও ব্যক্তিহত্যার লাইন ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য হতো মূলত 'শ্রেণীশত্রু' হিসেবে চিহ্নিতরাই। বস্তুত 'মাওবাদীরা' যে সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করছেন, তা কার্যত সিপিআই(এম)-এর ক্ষমতামদমত্ত পার্টিতন্ত্রেরই এক ধরনের— যদিও অনেক স্থূল ও সশব্দ— পুনরাবৃত্তি। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সামনে শিক্ষককে হত্যা, শিশুর সামনে তার বাবা-কাকাকে হত্যা, মাঝেমাঝে এমনকি শত্রু নিধন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে হত্যা তো প্রায়ই চলছে।

মাও বার বার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, তাঁরা ব্যক্তিহত্যা সমর্থন করেন না, চীন বিপ্লব চলাকালীন ব্যক্তিহত্যার ঘটনা ঘটেছে যথাসম্ভব কম, তা-ও সাধারণত শোষিত নিপীড়িত মানুষের চাপে। আর ভারতে তাঁর নামে জয়ধ্বনি তুলতে তুলতে তাঁর নাম গ্রহণকারী 'মাওবাদীরা' এতো ব্যক্তিহত্যার ঘটনা ঘটাচ্ছেন যে হিসেব রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ছে। দু'দশকের বেশি সময় ধরে চলা চীন বিপ্লব বিজয় অর্জন করার জন্য মোট কতগুলি ব্যক্তিহত্যা ঘটিয়েছিল তার যদি কোনো হিসেব করা যায়, তবে সুনিশ্চিতভাবেই ধরা পড়বে— এখনও পর্যন্ত বিজয় অর্জন করার ধারে-কাছে নেই যাঁরা, সেই 'মাওবাদীরা' গত দু'দশকে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় ব্যক্তিহত্যা ঘটিয়েছেন। তাতে বিপ্লবের কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে— এরকম সিদ্ধান্তের পিছনে আর যাই থাক, অন্তত সমাজ-বিপ্লবের দ্বান্দ্বিকতার সম্যক উপলব্ধি যে নেই, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। উল্টোদিকে, মাঝেমাঝে এমন সব জঘন্য হিংসাত্মক ঘটনা মাওবাদী কর্মীরা ঘটাচ্ছেন যে প্রায়শই নেতৃত্বকে পরে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে ভুল স্বীকার করতে হচ্ছে। প্রমাণিত হচ্ছে, রাজনীতি বন্দুককে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, বরং বন্দুকই বেশি বেশি করে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। এবং এধরনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ রাজনীতি ক্রমশ পিছু হঠছে। ভ্রান্ত লাইনের পরিণতি কিন্তু এরকমই হবার কথা।

এ-প্রসঙ্গে দু'টি কথা বলা দরকার মনে করছি। প্রথমত, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ পুঁজিবাদের অবসানের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজবিপ্লবের আবশ্যিকতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অর্থনীতির সবচেয়ে অগ্রসর রূপের সঙ্গে সম্পর্ক, ব্যক্তিগত উৎপাদনের বিপরীতে যৌথ স্বার্থ-সংগঠন ও শৃঙ্খলার তীব্র বোধ এবং নিজেদের মুক্তির জন্য সমস্ত শ্রেণীশোষণের অবসান ঘটানোর দূরায়ত লক্ষ্যের সচেতন উপলব্ধিই শ্রমিকশ্রেণীকে অন্যান্য সমস্ত শ্রেণী থেকে আলাদা করে দেয়। সে কারণেই বামপন্থা বিপ্লবের বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে সমস্ত কমিউনিস্টদের, বিশেষত তাদের নেতৃত্বকারীদের, শ্রমিক-শ্রেণীর চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠাটাকে আবশ্যিক একটি পূর্বশর্ত হিসেবে হাজির করে। সেজন্যই রাশিয়ায় তো বটেই, এমনকি আধুনিক শিল্প বিকাশ যেখানে প্রায় ঘটেই নি, ফলত শ্রমিকসংখ্যাও ছিল খুবই সীমিত, সেই চীনেও যাঁরা প্রথম থেকে বিপ্লবের নেতৃত্বে এসেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের প্রাথমিক পর্বে শ্রমিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা অর্জনের লড়াই

Second Time

চালিয়েছেন। কিন্তু আজকে যে 'মাওবাদীরা' ভারতীয় রাষ্ট্রকে পর্যন্ত তটস্থ করে তুলেছেন, সমাজবিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের আবশ্যিকতার কথা তাঁদের দলিলে তাত্ত্বিকভাবে স্বীকার করলেও শ্রমিক আন্দোলন-সহ সমস্ত গণআন্দোলন কার্যত বয়কটের ফলে তাঁদের প্রায় কারোরই শ্রমিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা নেই, শ্রেণীগতভাবে সর্বহারাকরণের (proleterisation) তাঁরা সুযোগই পান নি। পরিণতিতে সম্ভাবনা এটাই যে, নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিতরা শ্রেণীগতভাবে মধ্যবিত্ত, কৃষক বা খুব বেশি হলে লুম্পেন সর্বহারাদের মধ্যে থেকে উঠে আসা বিপ্লবীরা। ফলত এই নেতৃত্বের কাছে শ্রেণীচেতনার প্রতিফলন প্রত্যাশা করার যুক্তি থাকছে না।

দ্বিতীয়ত, সমাজ বিপ্লব-উত্তর নতুন সমাজে রাষ্ট্র ও উৎপাদনের শুধু মালিকানাই নয়, নিয়ন্ত্রণও মেহনতি মানুষের কাছে হস্তান্তরিত হওয়াটা আবশ্যিক। কারণ বিপ্লব বিজয় অর্জন করলেও, রাষ্ট্র ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ সরাসরি মেহনতি মানুষের হাতে আসে না— আসে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে পার্টির হাতে। সমাজতন্ত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ধরা পড়েছে, ক্ষমতা পার্টির হাতেই থেকে যাবার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত একদিকে মেহনতি মানুষের মধ্যে ব্যাপকতর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বদলে তারা ক্রমে ক্রমে ক্ষমতা ও উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; অন্যদিকে পার্টির মধ্যেকার অধঃপতিত বা নতুন উদ্ভূত বুর্জোয়া উপাদানেরা সমস্ত ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ দখল করে নিয়েছে। এই আশংকার কথা মাথায় রেখেই কোনোরকম পূর্ব-অভিজ্ঞতাবিহীন প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিন প্রথম থেকেই মেহনতি জনগণের প্রতিনিধিদের (অর্থাৎ পার্টির) হাত থেকে সরাসরি মেহনতিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার প্রক্রিয়া গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই প্রক্রিয়া সফল হয়নি, পরিণতিতে সেই দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তাই মাওসেতুং বিপ্লবের ১৭ বছর পরে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে নতুন করে মেহনতি জনতার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। সেই প্রক্রিয়া চীনের বিপ্লবীরা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে পারেননি, ফলে সেদেশেও ক্রমে পুঁজিবাদী পথযাত্রীরা সমস্ত ক্ষমতা দখল করেছে। বস্তুত সারা দুনিয়া জুড়ে বামপন্থার প্রথম বিজয়সূচক পদক্ষেপ তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অনুশীলন পর্ব বিধ্বস্ত হয়ে যাবার পরে সঠিকভাবেই এই উপলব্ধি গড়ে উঠেছে যে, আজকের দুনিয়ায় সমাজ-বিপ্লবের নতুন প্রচেষ্টা শুরু করতে গেলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগেই নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যেকার, এবং বৃহত্তর পটভূমিকায় পার্টি ও জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতা— অর্থাৎ এক কথায় ব্যাপক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের সমস্যার সমাধান করার প্রক্রিয়া— চালিয়ে যেতে হবে, যাতে করে পার্টির মধ্যে, কিংবা বিপ্লবোত্তর সমাজে গণতন্ত্রের প্রশ্নটির সঠিক সমাধান করা যায়। 'মাওবাদীদের' কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই প্রক্রিয়া দূরের কথা, তার চেতনা আছে বলে প্রমাণ মেলে নি, বরং বিরোধী মতাবলম্বীদের কণ্ঠরোধ করার প্রবণতাই অনেক বেশি ধরা পড়েছে। সত্যিই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারলে কোন গণতন্ত্র তাহলে তাঁরা কার্যকর করবেন?

আর সেকথা যদি আপাতত না-ও তুলি, তবু অন্যদিকে, ভারতের মধ্যাঞ্চলের ওই সব জঙ্গলমহলের বাইরে রয়ে গেছে প্রায় ৯০ শতাংশ জনসংখ্যা বিশিষ্ট যে বিশাল ভারত, 'মাওবাদীদের' সশস্ত্র বিপ্লব কোনোক্রমেই যেখানে এখনও পর্যন্ত সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেই, যেখানে প্রতিদিন শ্রমিক-কৃষক সহ ব্যাপক মানুষ তীব্র শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন— বিশ্বায়নের তীব্রতা বৃদ্ধি, ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি এবং জনকল্যাণকর সরকারি প্রকল্পগুলি ক্রমশ গুটিয়ে নেওয়ার ফলে বস্তুত ব্যাপক মানুষের অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হয়ে উঠেছে, এবং যেখানে এখনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের অন্তত কিছু সুযোগ ও অবকাশ রয়েছে, এবং মানুষ যেখানে বহু সময়েই স্বতঃস্ফূর্ত বা সংগঠিত প্রতিবাদে ফেটে পড়ছেন, পাশাপাশি অনেক সময় ভোট দিয়ে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে জিতিয়েও আনতে পারছেন এবং এমনকি সময় সময় নিজেদের অপছন্দের শাসকদলকে পর্যন্ত গদি থেকে টেনে নামাতে পারছেন অস্ত্র ছাড়াই— ভোটের মাধ্যমে, সেখানে এই 'মাওবাদীদের' কোনোই সক্রিয় ভূমিকা নেই, নিজেদের সমর্থনে কিছু মিটিং, মিছিল বা টাকা তোলার কাজ ছাড়া। সেই ৯০ শতাংশ ভারতকে কার্যত বাদ দিয়ে ভারতে সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত করা সম্ভব— এমন দাবি নিশ্চয়ই কেউ করবেন না। তাহলে ভারতে সমাজ-বিপ্লবের পুরোধা হবেন আজকের 'মাওবাদীরা'— এই চিন্তারও কোনো সারবত্তা কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

উপসংহারের বদলে

ইতিহাস বিভিন্ন দেশে বারবার প্রমাণ করেছে যে, একদিকে যেমন আত্মত্যাগ আর বিপ্লব সমার্থক নয়, ঠিক তেমনি রক্তপাত ঘটানোর আধিক্যের মধ্যেও নিহিত নেই বিপ্লবের বিজয়ের বেশি সম্ভাবনা। বরং মূল কথাটি অনেক আগেই বলে গেছেন সেই মহান বিপ্লবী, যাঁর নাম 'মাওবাদীরা' নিজেদের দলের নামের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছেন তিনি, অর্থাৎ মাও সেতুং : লাইনের সঠিকতা বা বেঠিকতার উপরই নির্ভর করে বিপ্লবের সাফল্য। সব মিলিয়ে তাই নিঃসন্দেহে এক কথায় বলা যায়, 'মাওবাদীরা' যতোই আত্মত্যাগ করুন এবং সেজন্য আমাদের সহানুভূতি বা শ্রদ্ধা অর্জন করুন, মাও সেতুং-এর বিপ্লবী তত্ত্ব ও অনুশীলনের মূলত বিরোধী তাদের এই উগ্র 'বাম' দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ

যতোদিন তাঁরা বর্জন না করবেন, ততোদিন বিপ্লবী লড়াইয়ের সর্বাত্মক বিকাশে শেষ বিচারে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন না। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সহাবস্থান করছে যে সিপিআই(এম), তার সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির ও একচেটিয়া পুঁজির চরম সন্ত্রাসের শিকার এই 'মাওবাদীদের' সমান দৃষ্টিতে দেখলে অবশ্যই চলবে না; ভারতে এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে রাষ্ট্রের নৃশংস আক্রমণ ও বিপুল সংখ্যক আদিবাসীদের শোষণ-নিপীড়ন-যন্ত্রণার ও প্রতিরোধের কথা জাতীয় রাজনীতির পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসার জন্য অবশ্যই তাঁদেরকে নৈতিক সমর্থন ও অভিনন্দন জানাতে হবে; কিন্তু তাই বলে তাদের মৌলিক ভ্রান্তির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকলেও, বা দেখেও চুপ করে থাকলে চলবে না। আজ এই মুহূর্তে এই বিষয়টি এদেশে নিজেদের চেতনা ও মানবিক বোধকে পুঁজির পদতলে বিসর্জন দেন নি এরকম ব্যাপক মানুষের বিশেষ মনোযোগ দাবি করছে। চলমান এই লড়াইয়ের প্রক্রিয়ায়, সে হিংসাত্মক বা অহিংস যা-ই হোক না কেন, বা সেসব লড়াইয়ে যতো ভুল ও বিচ্যুতিই থাক না কেন, রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে নৈতিকভাবে সেগুলির পাশে আমাদের দাঁড়াতেই হবে, দাবি তুলতে হবে রাষ্ট্রীয় সেই অভিযান বন্ধ করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের উপর। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই লড়াইয়ে গণচরিত্রের বদলে বন্দুক-নির্ভরতার উপর একপেশেভাবে জোর দেবার ও ব্যক্তিহত্যার লাইন অনুসরণের এবং বিরোধীদের মতামতের ও গণতান্ত্রিক অধিকারের অবকাশ হরণ করার বিরুদ্ধেও সমালোচনা চালিয়ে যেতে হবে। লড়াইয়ের স্বার্থে সেই সব সমালোচনাকে 'রাষ্ট্রীয়' চরিত্রবিশিষ্ট বা আক্রমণ-যোগ্য বলে চিহ্নিত করার প্রবণতাটিও কিন্তু হবে ভ্রান্ত। কেননা, শেষ বিচারে, ইতিহাস তৈরি করেন জনগণই, বন্দুক বা অস্ত্র নয়। গণ-নির্ভরতা, বা মাও-এর ভাষায় বলতে গেলে, 'জনগণ থেকে জনগণের মধ্যে'-র গণলাইন বাদ দিয়ে লড়াই কিন্তু কোনো দিন কোনো দেশে জয়যুক্ত হয় নি। সমাজ-বিপ্লবকে যাঁরা সমর্থন করেন, তার পক্ষে দাঁড়াতে বা তার অনুকূলে ভূমিকা নিতে চান, তাঁদের তাই আজ জরুরি দায়িত্ব এই কথাটা সোচ্চারে ঘোষণা করা যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অতীত ও সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার আলোকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সেতুং চিন্তাধারার ভিত্তিতেই কেবল বিপ্লবী লড়াইয়ের অগ্রগতি ঘটতে পারে— লাইন ভুল হলে শত শুভেচ্ছা বা আত্মত্যাগও বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

তবুও শেষ পর্যন্ত একটা প্রশ্ন থেকেই যায় : ব্যাপক জনগণের শোষণমুক্তির মহান লক্ষ্যে আত্মোৎসর্গকারী, বিপ্লবের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অসাধারণ আত্মত্যাগের অনুপম ইতিহাস তৈরি করা সত্ত্বেও মৌলিকভাবে পথভ্রান্ত এই 'মাওবাদীদের' সম্পর্কে আমাদের কোন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা উচিত? সে প্রশ্নেরও উত্তর মিলবে মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানভাণ্ডার থেকেই। লেনিনের দাদা ছিলেন নিহিলিস্ট, জনগণের শোষণ-মুক্তির মহান লক্ষ্যে আত্মোৎসর্গকারী, জার আমলে তাঁর ফাঁসি হয়েছিল। লেনিন তাঁর আদর্শের প্রতি এবং মহান সেই আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও, তাঁর অনুসৃত পন্থার তীব্র সমালোচক ছিলেন। ঠিক ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রভৃতি আমাদের দেশের বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো— যাঁরা স্বাধীনতার জন্য বিনা দ্বিধায় আত্মোৎসর্গ করেছেন, কিন্তু যাঁদের গণ-আন্দোলন-বর্জিত বিপ্লবী কর্মকাণ্ড দেশের মুক্তির জন্য সঠিক ছিল না। আমরা তাঁদের অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাবো, তাঁদের মুক্তির দাবিতে পথে নামবো এবং তাঁদের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নেমে এলে তার প্রতিবাদে সোচ্চার হবো (ঠিক যেমন হতেন রবীন্দ্রনাথ, বিপ্লবী স্বাধীনতাসংগ্রামীদের অনুসৃত পন্থার প্রতি সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও), কিন্তু তার সাথে সাথে (রবীন্দ্রনাথের মতোই) তাঁদের ভ্রান্ত পথের জন্য তীব্র সমালোচনাও করতে হবে, যাতে তাঁরা তাঁদের ভ্রান্তি উপলব্ধি করে এখনও-পর্যন্ত-অধরা বিপ্লবী পথের সন্ধানে সতত ব্রতী হন। কেননা ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠা শ্রেণী-সংগ্রামের প্রেক্ষিতে সেটাই হবে একজন বিপ্লবীর মূল পরীক্ষা।

তথ্যসূচী

১. মাওসেতুং : চীনের কমিডনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে বক্তৃতা। ১৯৪৫

২. Mohan Ram: 'The Telengana Peasant Armed Struggle, 1946-51', *EPW*, Jun. 9, 1973; Sundarayya, *Telengana People's Struggle and Its Lessons*, Communist Party of India (Marxist), Calcutta, 1972; কাফি খাঁ : *তেলেঙ্গানা বিপ্লব*, ১৯৭১

৩. উদ্ধৃত : Mohan Ram, *ibid*

৪. Peking Review: 16 August, 1967

৫ Mao Tse-tung, Wang Ming, Po Ku, Wu Yu-Chang, Tung Pi-Wu and Teng Yen-Chao : 'The People's Political Council, Its Past Work and Present Tasks', Published originally in *Chiehfang* (Liberation), the organ of the Communist Party of China, in its issue of May 5, 1938, No. 32, and later published by New China Information Committee, Chungking, China, January, 1940.The document has been reprinted in*Revolutionary* D*emocracy*', September 2005.
(http://www.revolutionarydemocracy.org/rdv11n2/index.htm#Vol._XI,_No_2,_September_2005)

৬. *Strategy & Tactics of Indian Revolution*, CPI(Maoist)

Second Time